ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-II, November, 2025, Page No. 424- 434
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.02W.225

সাবেকি ভূরাজনীতি: ভূরাজনীতির সাবেকি চিন্তাবিদ এবং তাদের তত্ত্বের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনা

সৌমেন মণ্ডল, *রাজ্য সরকার অনুমোদিত কলেজ শিক্ষক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, শিশুরাম দাস কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 11.10.2025; Accepted: 21.11.2025; Available online: 30.11.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

To properly understand international politics or international relations, it is necessary to have a basic idea of geopolitics. This article primarily analyzes the concept of geopolitics and explores the ideas of prominent theorists in the field. It provides a brief introduction to the geopolitical thoughts of Friedrich Ratzel, Rudolf Kjellén, John Mackinder, Karl Haushofer, Alfred Thayer Mahan, and Nicholas Spykman. These theorists integrated geographical concepts with politics in their theoretical frameworks. The article explains how knowledge of geography enhances the study of politics and international relations, making it more relevant and practical. It also discusses how a state can play an active role in international politics due to geographical variations such as location, environment and resources. Geopolitical theorists have outlined how nation-states can influence international politics by developing their land and naval power. Additionally, the article addresses the concept of the Heartland and its significance in international relations. Finally, it describes how this theory influenced power competition and the balance of power in international politics during World War II and the Cold War.

Keywords: Geopolitics, geographical organism, Heartland, pivot area, sea power, Rimland

ভূরাজনীতির ধারণাটি খুব বেশি প্রাচীন নয়, উনবিংশ শতকের একেবারে শেষের দিকে ভূরাজনীতি ধারণার উদ্ভব হয়। প্রাথমিক পর্বে এই বিষয়টিকে কেবলমাত্র যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রেই ব্যবহার করা হত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র রূপে আত্মপ্রকাশ করলেও সেই সময় ভূরাজনীতির ধারণা কোনো পাঠ্য বিষয়েই স্থান পায়নি, সময়ের সাথে সাথে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে ভূরাজনীতির প্রাসঙ্গিকতা ও তাৎপর্য বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে ভূরাজনীতির ধারণা বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পাঠ্য বিষয় হিসাবে গ্রহণযোগ্যতা পায়। বস্তুত প্রাথমিক অবস্থায় শাস্ত্র হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় আদর্শবাদী ধ্যানধারণা অধিক প্রাসঙ্গিক থাকায় সেই সময় ভূরাজনীতির ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্থান করে নিতে পারেনি, পরবর্তীতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিসমাপ্তিতে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় বাস্তববাদী মূল্যবোধ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করলে ভূরাজনীতির ধারণা আন্তর্জাতিক সম্পর্কের আলোচনায় স্থান পায়। মূলত উনবিংশ শতকের শেষ থেকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় কালে ভূরাজনীতির ধারণা বিকাশ ও বিস্তার লাভ করে এবং সেই সময়ে প্রত্যক্ষভাবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের প্রয়োগ লক্ষ্য করা যায়। তবে দীর্ঘ সময়কাল পর্যন্ত আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তাত্ত্বিক আলোচনায় প্রত্যক্ষভাবে সাবেকি ভূরাজনীতি তত্ত্বের চর্চা সেইভাবে না হলেও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের তত্ত্বের সঙ্গে ভূরাজনীতির তত্ত্বের বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত প্রাথমিক অনুমান এবং পদ্ধতিগত

আলোচনার ক্ষেত্রে এই দুই তত্ত্বের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। সাবেকি বাস্তববাদী তত্ত্ব অনুসারে 'আন্তর্জাতিক সম্পর্ক হল একটি নৈরাজ্যের ক্ষেত্র যেখানে স্বার্থান্বেষী জাতি রাষ্ট্র গুলি পরস্পরের সঙ্গে ক্ষমতার প্রতিযোগিতায় সদা লীপ্ত' (Kenneth Waltz, pp. 120)। ঠিক একইভাবে সাবেকি ভূরাজনীতির তত্ত্ব গুলিও আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতার কথাই বলে। এই তত্ত্বের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়ই হল ভৌগোলিক উপাদানের ওপর ভিত্তি করে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতার প্রতিযোগিতা।

'ভূরাজনীতি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন সুইডিশ ভূবিজ্ঞানী রুডলফ জেলেন ১৮৯৯ সালে। ভূরাজনীতি এ ধারণাটি 'ভূগোল' তথা 'মানবিক ভূগোল' (Human Geography) সেখান থেকে 'রাজনৈতিক ভূগোল' এবং পরবর্তীতে ভূরাজনীতির জন্ম হয়েছে। ভূরাজনীতির ইংরাজি প্রতিশব্দ হল 'Geopolitics' এটি এসেছে জার্মান শব্দ 'Geopolitike' থেকে। ইংরাজিতে 'Geopolitics' শব্দটি দুটি শব্দের মিলিত রূপ 'geo' এবং 'politics'— 'Geo' অর্থাৎ ভৌগোলিক উপাদান যার মধ্যে রয়েছে সেই দেশের অবস্থান, আয়তন, পরিধি প্রভৃতি এবং 'Politics' শব্দটির দ্বারা বোঝানো হয় ক্ষমতা, প্রভাব, আধিপত্য বা ঐ ভৌগোলিক উপাদানের ওপর গড়ে ওঠা রাজনীতি। একটি দেশের ভৌগোলিক উপাদান ও তার পাশাপশি সেই দেশের ক্ষমতা, সামর্থ্য আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কিরূপ প্রভাব বিস্তার করে তার চর্চাই করে ভূরাজনীতি। অন্যভাবে বলা যেতে পারে যে ভৌগোলিক উপাদান যেমন— অবস্থান, প্রাকৃতিক সম্পদ, জনসংখ্যা কেমনভাবে অর্থনীতি ও প্রযুক্তি দ্বারা প্রভাবিত হয় এবং এগুলির দ্বারা রাষ্ট্রীয় স্তরে সম্পর্ক ও ক্ষমতা প্রতিযোগিতা কিভাবে বিবর্তিত হয় সে বিষয়ে আলোচনা করে ভূরাজনীতি। তবে ভূরাজনীতির সংজ্ঞা প্রদানের ক্ষেত্রে বিভিন্ন মত পার্থক্য গড়ে উঠেছে এর একক কোনো সংজ্ঞা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। ভূরাজনীতির বিভিন্ন তাত্ত্বিক বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূরাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন— হাউসোফারের মতে 'geopolitics as an ambitious science: geopolitics is the new national science of the state', হ্যাগানের মতে 'geopolitics is a contemporary rationalization of power politics', রুডলফ জেলেনের মতে ভূরাজনীতি হল 'the theory of the state as a geographical organism or phenomenon in space'. (Hu Zhiding, and Lu, Dadao, pp. 1773) আবার এনসাইক্লোপিডিয়া ব্রিটানিকা অনুসারে ভূরাজনীতি হল আন্তর্জাতিক সম্পর্কে ক্ষমতা প্রতিযোগিতার ওপর ভৌগোলিক উপাদানের প্রভাব। লঙ্গম্যান ইংলিশ ডিকশনারি অনুযায়ী দেশের অবস্থান, ভূ-প্রকৃতি, জনসংখ্যা ইত্যাদি রাজনীতির ওপর কিরূপ প্রভাব ফেলে তার অধ্যয়ন হল ভূরাজনীতি। ভূরাজনৈতিক তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতির আলোচনায় ইতিহাস এবং ভূগোলের জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন— অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান, জন ম্যাকাইন্ডার, জেবিগ্নিউ ব্রেজেন্সকি প্রমূখ ভূরাজনীতির তাত্ত্বিকগণ ভূগোল ও ইতিহাসের পারস্পরিক সম্পর্কের আলোকে ভূরাজনীতির ব্যাখ্যা করার প্রয়াস করেন। আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে ভূরাজনীতি বিদেশ নীতি চর্চার একটি বিশেষ পদ্ধতি রূপে কাজ করে এবং রাষ্ট্রীয় আচরণকে বিশেষভাবে অনুধাবন, বিশ্লেষণ ও অনুমান করতে সাহায্য করে। বিভিন্ন সময়ে তাত্ত্বিকগণ ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ভূরাজনীতির তাত্ত্বিক কাঠামো উপস্থাপন করেছেন, আলোচনার সুবিধার্থে ভূরাজনীতির ধারণাকে তিন ভাগে বিভাজিত করা যেতে পারে—

১. মহাদেশীয় শক্তির ধারণা (Concept of Continental Power)
২. সামুদ্রিক শক্তির ধারণা (Concept of Sea Power)
৩. উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা (Concept of Peninsula Power)

ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের আলোচনার কেন্দ্রীয় বিষয়ই হল 'মহাদেশীয় শক্তির' ধারণা। রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ অর্থাৎ ভূখণ্ডের বিকাশ, বিস্তার ও ক্ষমতার প্রতিযোগিতা এখানকার প্রধান আলোচ্য বিষয়। মহাদেশীয় শক্তির ধারণা প্রদানের ক্ষেত্রে জার্মান স্কুলের তাত্ত্বিকদের অবদানই বেশি। মহাদেশীয় শক্তির ধারণায় উল্লেখযোগ্য তাত্ত্বিকগণ হলেন— ফ্রেডরিখ রাটজেল, রুডলফ জেলেন, হ্যালফোর্ড জন ম্যাকাইন্ডার, কার্ল হাউসোফার প্রমুখ। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে কেনো কেবল মাত্র কিছু সংখ্যক রাষ্ট্র বেশি শক্তিশালী এবং কিভাবে একটি রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে শক্তিশালী হয়ে উঠতে পারে সে সমস্ত বিষয় নিয়ে আলোচনা করে এই তাত্ত্বিকগণ। ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে 'মহাদেশীয় শক্তি' ধারণার পাশাপাশি ব্রিটিশ ও আমেরিকান স্কুলের তাত্ত্বিকদের হাত ধরে 'নৌশক্তি' ধারণার বিকাশ ঘটতে থাকে যাদের মধ্যে উল্লেখ্য হলেন— অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান, জুলিয়ান করবেট প্রমূখ। এদের মতে পৃথিবীর উন্মুক্ত জলরাশির ওপর যে দেশের আধিপত্য যত বেশি হবে সেই দেশই বিশ্বের ওপর নিয়ন্ত্রণ কায়েম করতে বিশেষভাবে সক্ষম হবে। এছাড়া

বিংশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী পর্যায়ে 'উপদ্বীপীয় শক্তি' ধারণার জন্ম হয় যার প্রধান প্রবক্তা হলেন আমেরিকান স্কুলের তাত্ত্বিক নিকোলাস স্পাইকম্যান। যে সকল বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ধ্রুপদী ভূরাজনীতির তাত্ত্বিক জ্ঞানের বিকাশ ও বিস্তার ঘটিয়েছেন তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কিছু তাত্ত্বিকের দৃষ্টিভঙ্গি এখানে আলোচনা করা হল—

১. মহাদেশীয় শক্তির ধারণা:

১.১ ফ্রেডরিখ রাটজেল (Friedrich Ratzel, ১৮৪৪-১৯০৪):

জার্মান ভূবিজ্ঞানী ফ্রেডরিখ রাটজেলের প্রধান চর্চার বিষয় ছিল রাজনৈতিক ভূগোল ও নৃকূল বিদ্যা। তিনি রাজনৈতিক ভূবিদ্যার জনক হিসাবেও পরিচিত। তার লেখা প্রবন্ধ Laws on the spatial growth of states, ১৮৯৬ এবং তার বিখ্যাত গ্রন্থ political geography, ১৮৯৭ থেকে আমরা তার ভূরাজনীতির ধারণা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারি। তিনি তার আলোচনায় ভূগোলের ধারণাকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন তার মতে ভূগোলকে পরিহার করে সমাজ বিজ্ঞানের চর্চা অর্থহীন, যে সমস্ত তাত্ত্বিকরা ভূগোলের গুরুত্বকে অস্বীকার করে তাদের তত্ত্বের নির্মাণ করেন সে সকল তত্ত্বের ভিত্তি হল শূন্যে অবস্থানের মতোন। রাটজেলের মতে ভূগোলের সাহায্যে সমাজ বিজ্ঞানের ধারণা একটি মজবুত ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে এবং ভূগোলের যথার্থ অনুশীলনের মাধ্যমে আমরা রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সর্বাঙ্গীণ জ্ঞান লাভ করতে পারি। তিনি তার আলোচনায় রাষ্ট্রের আচরণকে আরও সুশৃঙ্খল পদ্ধতিতে চর্চার প্রয়াস করেন। রাটজেল সামাজিক ডারউইনবাদ ও পরিবেশ কেন্দ্রিক নির্ণয়বাদের জন্মদাতা। তিনি রাষ্ট্রের জৈব মতবাদের পাশাপাশি 'লেবেন্সরাম ও অটারকি' (Lebensraum and autarky) এই দুই ধারণার উপস্থাপন করেন। লেবেন্সরাম হল একটি নির্দিষ্ট ক্ষেত্র বা অঞ্চল যার বিস্তারের মধ্য দিয়ে রাষ্ট্রের পরিধির বিস্তার বা বৃদ্ধি ঘটে, আর অটারকির ধারণাটি আত্মনির্ভরতা বা স্বাধীনতার সাথে সম্পর্কিত। তার মতে রাষ্ট্র হল জৈবিক সত্ত্বার অনুরূপ যার একটি জীবনচক্র রয়েছে, যেখানে— রাষ্ট্রের জন্ম আছে, পরিপূর্ণতা আছে, অবক্ষয় আছে এবং অবশেষে মৃত্যু আছে। একটি জৈবিক সত্ত্বার জীবিত থাকতে যেমন খাদ্যের প্রয়োজন হয় ঠিক তেমনি রাষ্ট্রের অস্তিত্বকে টিকিয়ে রাখতে দরকার হয় খাদ্যের বা পুষ্টির আর রাষ্ট্র তার পার্শ্ববর্তী তুলনামূলক কম শক্তিশালী রাষ্ট্রের ভূখণ্ড অধিগ্রহণের মধ্য দিয়ে এই খাদ্যের চাহিদাকে পরিপুর্ণ করে। তার মতে প্রতিটি রাষ্ট্র প্রাকৃতিক আইন বা জৈবিক আইন অনুযায়ী আচরণ পালন করে এবং নিজ অস্তিত্ব বজায় রাখে, যে রাষ্ট্র এরূপ আচরণে ব্যার্থ হয় সেই রাষ্ট্রের দ্রুত অবক্ষয় ঘটে। তিনি তার চিন্তায় জনগণ এবং জাতিকে (race) বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তার মতে একটি জাতিই তার ভূখণ্ডের জন্য রক্ত ঝরায় এবং এমন এক সময় আসে যখন জাতি ও রাষ্ট্র একে অন্যের পরিপূরক হয়ে ওঠে তাই তার কাছে জাতিহীন রাষ্ট্রের ধারণা একেবারেই অর্থহীন, যেমন জার্মান ছাড়া জার্মানি কিংবা ফরাসী ছাড়া ফ্রান্সের ধারণা অর্থহীন। তার সময়ে অটোভন বিসমার্কের নেতৃত্বে ১৮৭১ সালে অখণ্ড জার্মান গঠিত হয় এবং তিনি জার্মানকে একত্রীত রাখতে তার ভূরাজনীতিক তত্ত্বের উপস্থাপন করেন। উল্লেখ্য যে ১৯৩০ এর দশকে নাজি বিস্তারকে বৈধতা প্রদানের উদ্দেশ্যে এই তত্ত্বের ব্যবহার করা হয়। হিটলার এই তত্ত্বকে ব্যবহার করে জার্মান পার্শ্ববর্তী দেশ গুলিকে আক্রমণ করেন এবং জার্মান জাতীয়তাবাদের বিস্তার ঘটান।

১.২ জন রুডলফ জেলেন (Johan Rudolf Kjellen, ১৮৬৪-১৯২২):

রুডলফ জেলেন ছিলেন একজন সুইডিশ ভূবিজ্ঞানী ও সাথে সাথে একজন রাষ্ট্রনীতিবিদ। তিনিই প্রথম ১৮৯৯ সালে 'ভূরাজনীতি' এই শব্দের উদ্ভাবন করেন। তিনি রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব মতবাদ দ্বারা বিশেষ ভাবে প্রভাবিত হন এবং রাষ্ট্রের এই জৈবিক তত্ত্বের ধারণাকে আরও সুসংবদ্ধ ও বিশ্লেষণধর্মী উপায়ে আলোচনা করেন। রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব তত্ত্বকে অনুসরণ করে জেলেন বলেন 'রাষ্ট্র হল একটি জৈবিক এবং ভৌগোলিক সত্ত্বা'। জেলেনের লেখা 'The State as a Life form' শীর্ষক গ্রন্থ ১৯১৬ সালে প্রকাশিত হয় যা জার্মানে বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করে। তিনি মনে করেন রাষ্ট্র হল একটি গতিশীল সত্ত্বা যা বিকাশের সাথে সাথে নিজের ক্ষমতাকে ও বৃদ্ধি করে। তিনি সাংস্কৃতিক বিস্তারকে রাষ্ট্রীয় বিকাশের মূল চালিকাশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন, তার মতে যে রাষ্ট্রের সংস্কৃতি যত বেশি গৌরবময় এবং উন্নততর সেই রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে তত বেশি শাসন ক্ষেত্রের পরিসীমা বৃদ্ধি করার অর্থাৎ সেই রাষ্ট্র তত বেশি পরিমাণ ভূখণ্ডের ওপর নিজ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে সক্ষম হবে। উন্নত সংস্কৃতি খুব স্বাভাবিক ভাবে নিজ ভূখণ্ডের সীমানা অতিক্রম করে অন্য রাষ্ট্রের ভূখণ্ডে নিজ প্রভাব ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আর এইভাবে সংস্কৃতি রাষ্ট্রের বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং অন্য ভূখণ্ড অধিগ্রহণকে বৈধতা দেয়। জেলেন তার

ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে রাটজেলের জাতির ধারণার থেকে সংস্কৃতিকেই রাষ্ট্রের ঐক্যের ক্ষেত্রে অধিক প্রাধান্য দিয়েছিলেন। তিনি রাষ্ট্রের শক্তিশালী হয়ে উঠতে প্রধানত পাঁচটি অঙ্গের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন—

১) ক্রাটোপলিটিক (Kratopolitik) বা সরকারের পরিকাঠামো ২) ডেমোপলিটিক (Demopolitik) বা দেশের জাতিগত উপাদান ৩) স্যোসিওপলিটিক (Sociopolitik) বা সামাজিক কাঠামো ৪) ওয়েকোপলিটিক (Oekopolitik) বা অর্থনৈতিক উপাদান যা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার নির্ণায়ক ৫) জিওপলিটিক (Geopolitik) বা ভৌগোলিক উপাদান। ১৯১৭ সালে জেলেন আরও কিছু ধারণার অবতারণা করেন— প্রথমত, রাইস (Reich) এই ধারণাটি লেবেন্সরাম ধারণার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণার মধ্য দিয়ে তিনি ভূখণ্ড রক্ষার্থে শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রস্তুতের কথা বলেন যা পরিচালিত হবে কেন্দ্রীয় প্রশাসনিক সংস্থা দ্বারা। দ্বিতীয়ত, ভল্ক (Volk) এই ধারণাটি জাতির ধারণার সাথে যুক্ত, কিভাবে একটি নৃকুলগত জাতি অন্য জাতি গোষ্ঠী থেকে উচ্চতর তার আলোচনা করেন। তৃতীয়ত, হাওসাল্ট (Haushalt) এই ধারণাটি ভূখণ্ডের দখল ও নিয়ন্ত্রণের সাথে সম্পর্কিত। চতুর্থত, জেসেলসাফট (Gesellschaft) যা রাষ্ট্রের সংস্কৃতি ও জনসংখ্যার সাথে সম্পর্কিত। এই ধারণা গুলি জার্মানিকে বিশ্ব ক্ষমতা রূপে প্রতিষ্ঠিত করতে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল এবং পরবর্তীতে ইটালি ও জাপান একইভাবে এই ধারণা গুলিকে গ্রহণ করেছিল।

১.৩ হ্যালফোর্ড জন ম্যাকাইন্ডার (Halford John Mackinder, ১৮৬১-১৯৪৭):

ম্যাকাইন্ডার ছিলেন ব্রিটিশ রাজনীতিবিদ ও একই সাথে ধ্রুপদী ভূরাজনীতির একজন অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা। ম্যাকাইন্ডারকে ভূরাজনীতি ও ভূকৌশলের জনক হিসাবে অভিহিত করা হয়। তিনিই প্রথম যথাযথভাবে ভূরাজনীতির ধারণাকে তাত্ত্বিক স্তরে উন্নীত করেন। তার মতে ভূরাজনীতি হল রাজনীতির ওপর ভূগোলের প্রভাব- কেমনভাবে ভূখণ্ড, দূরত্ব, পরিবেশ, জলবায়ু প্রভৃতি বিষয় রাষ্ট্র ও সাথে সাথে জনগণের ওপর প্রভাব বিস্তার করে সে সম্পর্কিত আলোচনা। তিনি ইতিহাস এবং ভূগোলের যৌগিক সম্পর্কের নিরিখে বিশ্ব রাজনীতিকে ব্যাখ্যা করেছেন। তার মতে ভৌগোলিক বৈচিত্রের কারনেই এথেন্স সামুদ্রিক শক্তি এবং স্পার্টা স্থলশক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল। ম্যাকাইন্ডার মনে করেন যে বিশ্ব রাজনৈতিক ইতিহাসে সব সময় স্থলশক্তির সাথে নৌশক্তির দ্বন্দ হয়েছে এবং স্থলশক্তিই বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। তিনি মূলত স্থলশক্তির ওপরই অধিক গুরুত্ব প্রদান করেছিলেন, তার মতে স্থলশক্তির মাধ্যমে নৌশক্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। তিনি ভূরাজনীতির ধারণাকে নৃকুলগত (Ethnocentric) বা আঞ্চলিক চিন্তা ভাবনা থেকে মুক্ত করে এক সার্বিক রূপ প্রদানের চেষ্টা করেন। তার প্রধান দুটি লক্ষ্য ছিল প্রথমত, ব্রিটেনে ভূগোলকে স্বতন্ত্র 'বৈজ্ঞানিক' শাস্ত্র হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা ও দ্বিতীয়ত, সমগ্র বিশ্বে ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদকে টিকিয়ে রাখতে এক সুসংহত তত্ত্বের নির্মাণ করা।

বিশ্ব ক্ষমতা সম্পর্কে ম্যাকাইন্ডারের প্রাথমিক অনুমানকে দুটি পর্বে বিভাজিত করা যায়, প্রথম পর্ব ছিল ১৯০০ দশকের শুরু থেকে ১৯১৮ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তি পর্যন্ত। এই সময় তিনি মনে করতেন কাইজার দ্বিতীয় উইলিয়ামের নেতৃত্বে জার্মানি হল ক্ষমতাশীল ও আক্রমণাত্মক একটি রাষ্ট্র এবং এই জার্মানিই ভবিষ্যতে বিশ্ব শক্তি হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। দ্বিতীয় পর্ব, ১৯১৯ সাল থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত, এই পর্বে তিনি তার উপলব্ধির পরিবর্তন করেন, দুই বিশ্বযুদ্ধে জার্মানের পরাজয় এবং আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষমতা বৃদ্ধির ফলে তিনি মনে করেছিলেন যে ভবিষ্যতে ইউরেশিয়াতে সোভিয়েত ইউনিয়নই সর্বাধিক শক্তিধর রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। ম্যাকাইন্ডার তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বকে সময় ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির পরিবর্তনের সাথে সাথে পরিবর্তন করেন, তিনি যথাক্রমে ১৯০৪ সালে পাইভোট অঞ্চলের (pivot area) ধারণা, ১৯১৯ সালে Heartland বা হৃদভূমির ধারণা এবং ১৯৪৩ সালে মিডল্যান্ড বেসিন (Midland basin) -এর ধারণা প্রদান করেন। ১৯০৪ সালে 'The geographical pivot of history' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন এবং বলেন যে, ভবিষ্যতে ইউরেশিয়া হয়ে উঠবে সমগ্র বিশ্ব নৌশক্তির কাছে অজেয় এক অঞ্চল। ইউরোপ, এশিয়া এবং আফ্রিকা এই তিন মহাদেশকে যুক্ত করলে একটি বিশাল স্থলভাগের জন্ম হয় যা পৃথিবীর মোট ভূখণ্ডের দুই তৃতীয়াংশ। এই বৃহৎ অবিচ্ছিন্ন ভূখণ্ডের কেন্দ্রীয় অঞ্চলটি হল— উত্তর থেকে উত্তর-পশ্চিম ইউরোপকে নিয়ে গঠিত বিশাল সমতলভূমি, পূর্ব ইউরোপ ও সাইবেরিয়া অঞ্চল, দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্বে মৌসুমি অঞ্চল। ১৯০০ সালের পরবর্তীকালে এই অঞ্চলটি উৎপাদন, বাণিজ্য ও তিন মহাদেশের সাথে যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি লাভ করেছিল তাই ম্যাকাইন্ডার বিস্তির্ণ এই ভূখণ্ডকে বিশ্ব রাজনীতির 'pivot area' বলে উল্লেখ করেন।

১৯১৯ সালে তার 'Democratic ideals and reality' শীর্ষক গ্রন্থে তিনি নতুন ভাবে বিশ্ব রাজনীতিকে উপস্থাপন করেন। আফ্রিকা, ইউরোপ, এশিয়া বা আফ্রো-ইউরেশিয়ার বিস্তির্ণ ভূ-ভাগকে তিনি বিশ্ব দ্বীপ বা 'World Island' নামে আখ্যায়িত করেন। এই বিশ্ব দ্বীপের কেন্দ্রস্থ অঞ্চল যা তিনি তার পূর্ববর্তী থিসিসে 'পাইভোট অঞ্চল' হিসাবে উল্লেখ করেছিলেন সেই পাইভোট অঞ্চলের নাম পরিবর্তন করে ঐ অঞ্চলকে তিনি 'Heartland বা হৃদভূমি' হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই হৃদভূমি আবৃত রয়েছে পশ্চিমে ভল্গা নদী, পূর্বে সাইবেরিয়া, উত্তরে আর্কটিক মহাসাগর, দক্ষিণে হিমালয় পর্বতমালা দ্বারা অর্থাৎ হৃদভূমিকে কেন্দ্র করে প্রাকৃতিক এক আবরণ তৈরি হয়েছে যে আবরণ ভেদ করে হৃদভূমিকে দখল করা বিশ্ব শক্তির কাছে কঠিন কাজ। হৃদভূমিকে ঘিরে পশ্চিম ইউরোপ, দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়া, ভারত, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং চীন এই অঞ্চল গুলি মিলিত ভাবে এক অন্তর্বেষ্টনী তৈরি করে আর এই অঞ্চলের পশ্চিমে ইংল্যান্ড ও পূর্বে জাপান এই দুই দ্বীপ (outlying island) অবস্থান করছে। এছাড়া উত্তর আমেরিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, আফ্রিকার দক্ষিণাংশ এবং অস্ট্রেলিয়াকে নিয়ে বহির্বেষ্টনী গড়ে উঠেছে। তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব অনুযায়ী এই আবৃত হৃদভূমির একমাত্র প্রবেশ পথ হল পূর্ব ইউরোপ 'Eastern gate is the only key to control heartland' (H. Mackinder. 1904, pp. 424) তাই তিনি হৃদভূমি দখলের পূর্ব শর্ত হিসাবে পূর্ব ইউরোপীয় অঞ্চলকে চিহ্নিত করেছেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাকাইন্ডার তার The Geographical Pivot of History, 1904 শীর্ষক গ্রন্থে বিখ্যাত উক্তি প্রদান করেন 'Who rules East Europe commands the Heartland; who rules the Heartland commands the world island; who rules the world island commands the World' অর্থাৎ যে পূর্ব ইউরোপকে শাসন করবে সে হৃদভূমিকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যে হৃদভূমি শাসন করবে সে বিশ্ব দ্বীপকে নিয়ন্ত্রণ করবে এবং যে বিশ্ব দ্বীপকে শাসন করবে সে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

১৯৪৩ সালে জার্মান শক্তি পরাজিত হলে তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নকে ইউরেশিয়া অঞ্চলের ভবিষ্যতের ক্ষমতা বলয় হিসাবে চিহ্নিত করেছিলেন। জার্মানের পতনের পর সোভিয়েত ইউনিয়নই হল বৃহৎ স্থলশক্তিধর দেশ। এই সময় তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে ক্ষমতা ভারসাম্য প্রতিষ্ঠার জন্য ১৯৪৩ সালে তার লেখা 'The round world and the wining of peace' নামক গ্রন্থে 'মিডল্যান্ড বেসিনের' ধারণা প্রদান করেন। তার মতে পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পূর্ব প্রান্তকে ঘিরে মিডল্যান্ড বেসিন গঠিত হবে। এই পশ্চিম ইউরোপ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মিলিতভাবে সোভিয়েত শক্তির মোকাবিলা করতে সক্ষম। এই মিডল্যান্ড অঞ্চলের দেশ গুলির মধ্যে ভৌগোলিক উপাদান, উন্নয়নের মাত্রা ও সাংস্কৃতিগত সাদৃশ্য গড়ে উঠেছিল। সাথে সাথে উৎপাদন ক্ষমতা, সামরিক শক্তি এবং সামুদ্রিক ও আকাশ পথে যোগাযোগ এই অঞ্চলে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছিল। বলা যেতে পারে যে এই অঞ্চলটি নতুন সম্ভাবনাময় শক্তি হিসাবে বিশ্ব রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ করছিল, আর তাই তিনি এই অঞ্চলটিকে নতুন ক্ষমতা বলয় হিসাবে চিহ্নিত করেন। এই পর্বে তিনি মনে করেন বিশ্বে একটি মাত্র ক্ষমতা নয় বরং দুটি ক্ষমতা কেন্দ্র থাকবে একটি ইউরেশিয়ার হৃদভূমি যার নেতৃত্ব দেবে সোভিয়েত রাশিয়া এবং ওপর দিকে মিডল্যান্ড বেসিন যার নেতৃত্ব দেবে ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। এই তত্ত্বের অনুমান সত্য প্রমাণিত হয় যখন ঠাণ্ডাযুদ্ধ পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোকাবিলা করতে মার্কিন নেতৃত্বে ১৯৪৯ সালে উত্তর আটলান্টিক রাষ্ট্র জোট বা NATO গঠিত হয়।

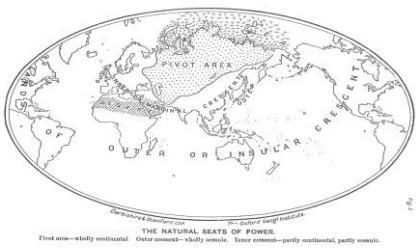

ম্যাকাইন্ডারের পাইভোট এলাকা, চিত্র-০১

(Source: https://ericrossacademic.wordpress.com/2015/03/05/of-heartlands-and-pan-regions-mapping-the-spheres-of-influence-of-the-great-powers-in-the-age-of-world-wars/ accessed on 10 Sep 25)

১.৪ কার্ল হাউসোফার (Karl Haushofer, ১৮৬৯-১৯৪৬):

মেজর জেনারেল অধ্যাপক ডঃ কার্ল হাউসোফার ছিলেন জার্মান সামরিক আধিকারিক, রাজনীতিবিদ এবং ভূরাজনীতির একজন মূখ্য প্রবক্তা। হাউসোফার জার্মান চিন্তাবিদ রাটজেলের রাষ্ট্রের জৈব তত্ত্বের ধারণা, জেলেনের অটারকির ধারণা ও ম্যাকাইন্ডারের 'Geopilitical pivot of History' দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হয়ে তিনি তার ভূরাজনীতির তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তার মতে ভূরাজনীতির অপরিহার্য অঙ্গ হল রাজনৈতিক ভূবিদ্যা, তিনি ভূরাজনীতিকে 'new national science of the state' বলে উল্লেখ করেন। হাউসোফার লেবেন্সরামকে সংজ্ঞায়িত করেন এইভাবে যে "রাষ্ট্রের অধিকার ও প্রধান কর্তব্য হল তার জনগণের প্রয়োজনীয় ভূখণ্ড ও সম্পদের বৃদ্ধি ঘটানো আর এর জন্য প্রতিটি রাষ্ট্রের অধিকার রয়েছে ন্যায় যুদ্ধ করার" (Klaus Dodds, 2010, pp. 78)। জেলেন যেভাবে অটারকির ধারণা প্রদান করেছিলেন তিনিও অটারকির মাধ্যমে রাষ্ট্রের আত্মনির্ভরতাকে চিহ্নিত করেন। এছাড়া প্যান অঞ্চলের ধারণা যার মধ্যে দিয়ে তিনি বলেন একটি রাষ্ট্র একই জনজাতি ও একই সংস্কৃতিযুক্ত অঞ্চলে নিজের বিস্তার ঘটাবে। ভূরাজনীতিক তত্ত্বে হাউসোফারের নিজস্ব অবদান হল তার গতিশীল সীমান্তের ধারণা। তার সময়ে রাষ্ট্রের স্থায়ী ও স্থিতিশীল সীমান্তের ধারণার বিপরীতে তিনি যুক্তি প্রদান করেন যে রাষ্ট্র গুলি লেবেন্সরাম, অটারকি ও প্যান অঞ্চলের ধারণার মধ্য দিয়ে সীমান্তের সদা বিস্তার ঘটাবে। তার মতে সীমান্ত হল এক জৈবিক সত্ত্বা যা সদা গতিশীল ও নিয়ত পরিবর্তনশীল। তিনি ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমির ধারণাকে তার তত্ত্বের কেন্দ্রীয় উপাদান বলে মনে করেন। এই হৃদভূমিই জার্মানির কাছে প্রয়োজনীয় লেবেন্সরাম, অটারকি ও প্যান অঞ্চলের সাফল্য এনে দেবে। হাউসোফার তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের উল্লেখ করেন—

১) একটি রাষ্ট্র অর্থনৈতিক দিক থেকে অবশ্যই আত্মনির্ভর হবে এবং যা তাকে সামরিক শক্তি বৃদ্ধিতে সাহায্য করবে।

২) জার্মান একটি প্রগতিশীল রাষ্ট্র, এর লক্ষ্য হল বিশ্বে তার পূর্ব গৌরব ফিরে পাওয়া। জার্মান জাতিই ভবিষ্যতে সমগ্র বিশ্বকে উচ্চতর সভ্যতা ও শান্তি উপহার দেবে।

৩) যেখানে জার্মান ভাষা, জার্মান জাতি ও জার্মান অর্থনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে সেই সমস্ত অঞ্চল গুলিকে একই ভূখণ্ডের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে, যেমন— অষ্ট্রিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, রুমানিয়া, রাশিয়া, তিনটি বাল্টিক রাষ্ট্র (ইস্টোনিয়া, লাটিভিয়া, লিথুয়ানিয়া) এবং সুইজারল্যান্ড প্রভৃতি।

৪) যদি জার্মানি বিশ্বের সর্ববৃহৎ দ্বীপ আফ্রো-ইউরেশিয়া অঞ্চলের ওপর আধিপত্য কায়েম করতে পারে তবে সে অজেয় সামরিক ও অর্থনৈতিক ক্ষমতার অধিকারী হবে এবং সে সমগ্র পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রণ করবে।

৫) আন্তর্জাতিক সীমান্ত জার্মানের জাতীয় স্বার্থের প্রয়োজনে পরিবর্তীত হতে পারে।

তিনি সমগ্র বিশ্বকে তিনটি প্যান অঞ্চলে ভাগ করেন— প্রথমত, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা মহাদেশ বা অ্যাঙ্গলো আমেরিকান জোট যার নেতৃত্ব দেবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। দ্বিতীয়ত, ইউরোপ, আফ্রিকা, পশ্চিম এশিয়া যার নেতৃত্ব দেবে জার্মান। তৃতীয়ত, ভারত, চীন, জাপান, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও অস্ট্রেলিয়া যার নেতৃত্ব দেবে জাপান। আর এই সমস্ত প্যান অঞ্চলের নেতৃত্বে থাকা দেশ গুলি এই অঞ্চলের মধ্যে তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব ও একাধিপত্য বিস্তার করবে। ১৯৪০ সালে হাউসোফার জার্মানের মিউনিখে একটি ভূরাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন যেখানে তিনি এবং তার সহকারীরা প্রচুর ভৌগোলিক তথ্য সংগ্রহ করেন যা পরবর্তীকালে জার্মানের ভবিষ্যৎ কৌশলি পদক্ষেপ নির্ধারণের ক্ষেত্রে সহায়তা করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিফ কাউন্সিল ১৯৪৫ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর একটি বিবৃতিতে বলেন 'হিটলারের ইন্টেল্যাকচুয়াল গডফাদার হলেন কার্ল হাউসোফার, তার চিন্তাধার ও মতাদর্শই হিটলারের বৌদ্ধিক জ্ঞানের উৎস। ভূরাজনীতি নিছকই কোনো অধীতব্য তত্ত্ব নয় বরং এটি ইউরেশিয়ার হৃদভূমি দখলের মাধ্যমে সমগ্র পৃথিবীর ওপর জার্মানের আধিপত্য বিস্তারের এক সুচারু পরিকল্পনা' (The Dmon of Geopolitics: How Karl Haushofer Educated Hitler and Hess by Holger H. Herwig, 2016, pp. 49)। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মান নীতির ফলে সৃষ্ট গণহত্যার জন্য হাউসোফারকেই দায়ী করা হয়। হাউসোফারের পূর্ববর্তী রাটজেল, জেলেন বা ম্যাকাইন্ডার প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতিকে একটা ধারণা হিসাবে চর্চা ও বিশ্লেষণ করেছিলেন কিন্তু হাউসোফারই প্রথম যিনি ভূরাজনীতিকে তাত্ত্বিক স্তর থেকে প্রত্যক্ষভাবে বাস্তব রাজনীতিতে প্রয়োগ করেন এবং ভূরাজনীতিকে আন্তর্জাতিক রাজনীতির কৌশলে ব্যবহার করেন।

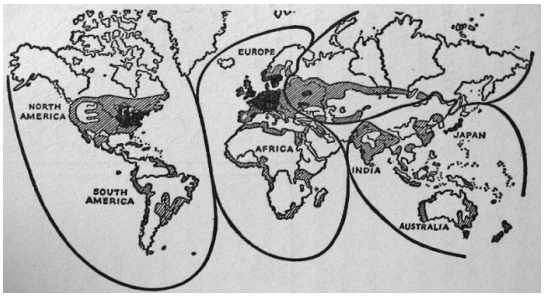

হাউসোফারের প্যান অঞ্চল, চিত্র – ০২

(Source: https://ericrossacademic.wordpress.com/2015/03/05/of-heartlands-and-pan-regions-mapping-the-spheres-of-influence-of-the-great-powers-in-the-age-of-world-wars/ accessed on 10 Sep 25)

২. সামুদ্রিক শক্তির ধারণা:

২.১ অ্যালফ্রেড থায়ার মাহান (Alfred Thayer Mahan, ১৮৪০-১৯১৪):

থায়ার মাহান ছিলেন একজন আমেরিকান নৌসেনাধ্যক্ষ এবং naval war college- এর অধ্যাপক। Blue Water School- এর তাত্ত্বিক মাহান আধুনিক নৌ ইতিহাসের জনক হিসাবে পরিচিত। তিনি যুদ্ধ নীতি ও যুদ্ধ কৌশলের ক্ষেত্রে পার্সিয়ান জেনারেল কার্ল ভোন ক্লসউইথজের চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। এছাড়া সামুদ্রিক শক্তি ও সামুদ্রিক কৌশলের ধারণা গ্রহণ করেছিলেন ফরাসী জেনারেল এন্টোনি হেনরি জমিনির লেখালিখি থেকে। তার সমসাময়িক ভূরাজনীতিজ্ঞদের মতো তিনিও মনে করতেন, যা নিজ রাষ্ট্র ও সমাজের জন্য উপযোগী তা সমগ্র মানব সমাজের জন্য কল্যাণকর। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে পশ্চিমি তাত্ত্বিকগণ সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে নৌতত্ত্বের নির্মাণ ও উন্নতির প্রয়াস করেন যাদের মধ্যে মাহানের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি মূলত ইতিহাসের ব্যাখ্যার মধ্য দিয়ে তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্ব গড়ে তোলেন। তার মতে কোনো দেশের রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের থেকে সেই দেশের সমুদ্রের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা বেশি ফলদায়ক, কারন সামুদ্রিক যোগাযোগের মধ্য দিয়েই এক রাষ্ট্রের সাথে অপর রাষ্ট্রের রাজনৈতিক সম্পর্ক নির্ধারিত হয়। নৌপথে আধুনিক যুদ্ধের সূচনা হয় ১৮৫৩ থেকে ১৮৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ, ১৮৬১ থেকে ১৮৬৫ সালে আমেরিকার গৃহযুদ্ধ, ১৮৯৮ সালে স্পেন-আমেরিকা যুদ্ধ এবং ১৯০৪ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধের মধ্য দিয়ে। মাহানের নৌশক্তির ধারণার জন্ম হয়েছিল সপ্তদশ শতাব্দীর ডাচ প্রজাতন্ত্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও স্পেনের যুদ্ধ এবং উনবিংশ শতাব্দীতে ফ্রান্স ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে নৌযুদ্ধের ইতিহাস থেকে। তার মতে ব্রিটিশ নৌবাহিনী ফরাসী শক্তিকে পরাজিত করতে পেরেছিল তার প্রধান কারন, ব্রিটেন ধারাবাহিকভাবে আক্রমণ এবং শক্তিশালী অবরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। তার মতে নৌ অভিজান সবসময় যুদ্ধ পরিকল্পনা ও অবরোধ গড়ে তুলে জয় লাভ করা যায়। মাহান বিশ্বাস করতেন যে শান্তিকালীন পর্বে রাষ্ট্রের উচিৎ উৎপাদন ও জাহাজের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং অধিক পরিমানে বৈদেশিক সম্পদ অর্জন করা। তার মতে একটি দেশের জাতীয় ক্ষমতা ও সমৃদ্ধি নির্ভর করে সংশ্লিষ্ট দেশ বিশ্ব সামুদ্রিক পথের ওপর কতটা কর্তৃত্ব দখল রাখতে পেরেছে তার ওপর। আমেরিকান নৌসেনাধ্যক্ষ মাহান ১৮৯০ সালে 'The influence of sea power upon history 1660-1783' এবং ১৮৯২ সালে 'The influence of sea power upon the French revolution and empire 1793-1812' এই দুই গ্রন্থ রচনা করেন যা সেই সময়কার ভূরাজনীতি ও ভূকৌশলগত আলোচনায় উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। মাহান তার এই দুই গ্রন্থে মুলত সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপের সফল নৌশক্তিধর দেশ গুলির ইতিহাস নিয়ে চর্চা করেন এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন— যে রাষ্ট্র সমুদ্রের ওপর যত বেশি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে পারবে সেই রাষ্ট্রই বিশ্ব রাজনীতিতে তত বেশি ক্ষমতার অধিকারী হবে।

মাহান একটি দেশের সমুদ্র শক্তি গড়ে তোলার জন্য প্রয়োজনীয় ছয়টি শর্তের কথা বলেন—

১) সুবিধাজনক ভৌগোলিক অবস্থান।
২) প্রচুর প্রাকৃতিক সম্পদ ও অনুকূল জলবায়ু এবং উন্মুক্ত উপকূলবর্তী স্থলভাগ, যেখান থেকে সহজে যোগাযোগ স্থাপন করা যায়।
৩) বিস্তীর্ণ ভূখণ্ড।
৪) অধিক জনসংখ্যা যা ভূখণ্ড রক্ষায় সহায়ক।
৫) সমুদ্র ও সামুদ্রিক বাণিজ্যের উপযুক্ত সমাজ ব্যবস্থা।
৬) এমন একটি জাতীয় সরকার যার সমুদ্রে আধিপত্য বিস্তারের বাসনা ও আগ্রহ রয়েছে।

মাহান তার 'Influence of sea power upon history' গ্রন্থে ব্রিটিশ নৌশক্তির উত্থান এবং সমগ্র বিশ্ব ব্যাপী সাম্রাজ্য বিস্তার ও বাণিজ্যিক প্রগতির ইতিহাসকে বর্ণনা করেন। তার মতে ব্রিটেনের ভৌগোলিক অবস্থানের নিরিখে ব্রিটেন উন্মুক্ত একটি রাষ্ট্র যার চারিদিকেই জলরাশি। তিনি উল্লেখ করেন যে বিট্রেনের রয়্যাল নেভি পৃথিবীর সমগ্র গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক পথ যেমন— সুয়েজ খাল, এডেন, আলেকজেন্ড্রিয়া, জিব্রাল্টার প্রণালী, ইংলিশ চ্যানেল, উত্তর সাগর এছাড়াও ভারত, সিঙ্গাপুর, হংকং এবং পশ্চিম গোলার্ধে ফকল্যান্ড ও ওয়েস্টইন্ডিজ প্রভৃতি অঞ্চলে উপনিবেশ গড়ে তুলে এই সমস্ত অঞ্চলের বিস্তীর্ণ জলরাশির ওপর একাধিপত্য কায়েম করেছিল। তিনি আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান প্রভাব বিস্তারে উদ্বিগ্ন ছিলেন। রাশিয়া সেই সময় আফগানিস্তান ও পার্সিয়ার মধ্য দিয়ে ভারত মহাসাগরে, দক্ষিণ-পূর্বে মাঞ্চুরিয়া হয়ে প্রশান্ত মহাসাগরে এবং সুদূর পূর্ব ও পশ্চিম এশিয়াতে নিজের প্রভাব বিস্তারের প্রয়াস করেছিল। মাহানের মতে এশিয়া হল ব্রিটিশ নৌশক্তি এবং রাশিয়ান স্থলশক্তির মধ্যে প্রধান প্রতিযোগিতার ক্ষেত্র। তিনি মনে করেন নৌশক্তির দ্বারা কেবল মাত্র রাশিয়ার প্রান্তীয় অঞ্চলে আক্রমণ করা যাবে, কিন্তু রাশিয়ার কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে অবরুদ্ধ করতে হলে ব্রিটিশ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জাপান এবং জার্মানিকে ঐক্যবদ্ধ ভাবে প্রয়াস করতে হবে। এইরকম প্রয়াস আমরা ঠাণ্ডাযুদ্ধ পর্বে NATO ও ANZUS জোটের মধ্যে দিয়ে লক্ষ্য করেছি। ১৯০৫ সালে রাশিয়ার রাজনৈতিক অস্থিরতার কারনে রাশিয়ার অভ্যন্তরীণ দুর্বলতা প্রকাশ পায় এবং বিশ্ব রাজনীতিতে রাশিয়ার প্রভাব কমতে থাকে এর পাশাপাশি অপর দিকে জার্মানির সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি পেতে থাকে। এই পর্বে মাহান তার বিশ্ব ক্ষমতার ধারণাকে সংশোধন করেন ও রাশিয়ার বদলে জার্মানকে ভবিষ্যতের বিশ্ব স্থলক্ষমতা হিসাবে বিবেচনা করেন। তিনি মনে করেন জার্মান শিল্প, কলকারখানা, রেল যোগাযোগ ও বাণিজ্য প্রভৃতি ক্ষেত্রে বিপুল উন্নতি লাভ করেছে এবং জার্মানের রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নতি হওয়ার ফলে অভ্যন্তরীণ ক্ষেত্রে সামরিক ও বাণিজ্যিক আদান প্রদান বৃদ্ধি পেয়েছে। তার মতে স্থলশক্তি হিসাবে জার্মানের বিস্তার ঘটলেও নৌশক্তি রূপে জার্মান কখনোই সমগ্র বিশ্বে আধিপত্য বিস্তার করতে পারবে না তার প্রধান কারন হল জার্মানির ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতা। ব্রিটেনের মতো উন্মুক্ত জলরাশি জার্মানির নেই, জার্মানের কেবল মাত্র উত্তরে উন্মুক্ত জলরাশি রয়েছে এবং জার্মানি সেনাকে আটলান্টিক মহাসাগরে পৌঁছাতে হলে ব্রিটেনের চোক পয়েন্ট উত্তর সাগর এবং ইংলিশ চ্যানেলে প্রবেশ করতে হবে আর এই অঞ্চল গুলিতে ব্রিটেনের একাধিপত্য কায়েম রয়েছে। তবে জার্মান যদি এই অঞ্চলে ব্রিটিশ রয়্যাল নেভিকে পরাজিত করতে পারে তাহলে সে সমগ্র ইউরোপ তথা গুরুত্বপূর্ণ সামুদ্রিক অঞ্চলের ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে সক্ষম হবে। মাহানের এই তত্ত্ব অনুযায়ী দুই বিশ্বযুদ্ধেই আমরা দেখেছি এই অঞ্চলে নৌশক্তিধর ব্রিটেনের সাথে স্থলশক্তিধর জার্মানির যুদ্ধ হয়েছে। মাহানের মতে জার্মানের সম্মুখে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সুদূর ভবিষ্যতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে ব্রিটেনকে জোট করতে হবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভৌগোলিক অবস্থানের কারনে বিশ্ব রাজনীতির সুবিধাজনক একটি অঞ্চলে রয়েছে। আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তীতে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত এলাকায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আর এই উন্মুক্ত অঞ্চলে অবস্থানের কারনে বিশ্বের যে কোনো প্রান্তে সংযোগের বিশেষ সুবিধা রয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। তাই মাহান মনে করেন ভৌগোলিক অবস্থান, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বিপুল সামরিক শক্তিতে বলীয়ান আমেরিকা যে কোনো মূহুর্তে ইউরেশিয়াকে চ্যালেঞ্জ করতে পারে। আর তার এই অনুমান সত্য প্রমাণিত হয়েছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন ব্রিটেনসহ সম্পূর্ণ মিত্রশক্তি যুদ্ধ সরঞ্জাম থেকে শুরু করে সেনাবাহিনী প্রেরণ সমস্ত ক্ষেত্রেই মার্কিন মুখাপেক্ষী হয়ে পড়েছিল।

৩. উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা:

৩.১ নিকোলাস জন স্পাইকম্যান (Nicholas John Spykman, ১৮৯৩-১৯৪৩):

নিকোলাস স্পাইকম্যান ছিলেন আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্কের অধ্যাপক এবং আন্তর্জাতিক সম্পর্কে বাস্তববাদী তত্ত্বের একজন প্রতিষ্ঠাতা। তিনি মাহানের সমুদ্রশক্তি ও ম্যাকাইন্ডারের স্থলশক্তির ধারণার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে এবং এই দুই তত্ত্বের সমালোচনার মধ্য দিয়ে তার উপদ্বীপীয় শক্তির ধারণা উপস্থাপন করেন। তিনি আন্তর্জাতিক সম্পর্কের চর্চায় ভূগোলের জ্ঞানকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছিলেন। তিনি মনে করেন যে বিদেশ নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে প্রাথমিক উপাদান হল সেই দেশের ভৌগোলিক অবস্থান। স্পাইকম্যান তার তত্ত্বে ভৌগোলিক অবস্থানের বিচারে তিন প্রকার রাষ্ট্রের উল্লেখ করেছেন—

প্রথমত, আবদ্ধ রাষ্ট্র (Land locked states) যেমন— আফগানিস্তান, সুইজারল্যান্ড, নেপাল, প্রভৃতি রাষ্ট্র।
দ্বিতীয়ত, দ্বীপ রাষ্ট্র (Island states) যেমন— ব্রিটেন, জাপান, ফিলিপিন্স, ইন্দোনেশিয়া প্রভৃতি রাষ্ট্র।
তৃতীয়ত, উপকূলবর্তী রাষ্ট্র (Coastal States) যেমন— ভারত, পাকিস্তান, ইরান, ইতালি প্রভৃতি রাষ্ট্র।

স্পাইকম্যান ১৯৪২ সালে তার লেখা 'America's strategy in world politics: The United States and the balance of power' গ্রন্থে ম্যাকাইন্ডারের পৃথিবীর বিভাজনকে গ্রহণ করেন এবং তার তত্ত্বে এর ভিন্ন নামকরণ করেন— প্রথমত, হৃদভূমি (Heartland), দ্বিতীয়ত, অন্তর্বেষ্টনী যার তিনি নামকরণ করেন রিমল্যান্ড (Rimland), তৃতীয়ত, বহির্বেষ্টনী যার নামকরণ করেন দূরবর্তী দ্বীপ ও মহাদেশ (offshore island and continents) এর মধ্যে রয়েছে আফ্রিকা ও অস্ট্রেলিয়া মহাদেশ, ব্রিটেন, জাপান এবং আটলান্টিক ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী অঞ্চল (উত্তর আমেরিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা) যা তিনি নতুন বিশ্ব বা new world বলে উল্লেখ করেন। ম্যাকাইন্ডার তার হৃদভূমির তত্ত্বে যে অন্তর্বেষ্টনীর উল্লেখ করেছিলেন অর্থাৎ ইউরোপ এবং এশিয়ার যে অঞ্চল হৃদভূমিকে বেষ্টন করে রয়েছে সেই অঞ্চল হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে নিষ্ক্রিয় এক অঞ্চল বা 'Zone of inactivity' পক্ষান্তরে নিকোলাস স্পাইকম্যান তার ভূরাজনৈতিক তত্ত্বে ইউরোপ এবং এশিয়ার এই অঞ্চলকে রিমল্যান্ড বলে অভিহিত করেন এবং তিনি এই অঞ্চলকে অধিক সক্রিয় অঞ্চল বা 'Zone of activity' বলে উল্লেখ করেন।

তার মতে স্থলশক্তি সম্পন্ন হৃদভূমি এবং সামুদ্রিক শক্তিসম্পন্ন বহির্বেষ্টনীর মধ্যবর্তী রিমল্যান্ড হল বিস্তীর্ণ নিরপেক্ষ এক অঞ্চল আর এই অঞ্চলই ভবিষ্যতে আন্তর্জাতিক রাজনীতির মূখ্য ক্ষেত্র হয়ে উঠবে। তিনি রিমল্যান্ডকে অধিক গুরুত্ব দিয়েছেন তার কারন হল এই অঞ্চলের অবস্থান, জনসংখ্যা, প্রাকৃতিক সম্পদ, সামুদ্রিক যোগাযোগ এবং শিল্প ও উৎপাদনের উন্নতি। তিনি মনে করেন কোনো একক শক্তি দ্বারা রিমল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়, স্থলশক্তি ও সমুদ্র শক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় রিমল্যান্ডকে নিয়ন্ত্রণ করা যেতে পারে। ইতিহাসের বিভিন্ন পর্বে ইউরেশিয়াতে রিমল্যান্ড অঞ্চলের ওপর আধিপত্য অর্জনের উদ্দেশ্যেই নৌশক্তি ও স্থলশক্তিধর রাষ্ট্র গুলির মধ্যে প্রত্যক্ষ যুদ্ধ হয়েছে। এই রিমল্যান্ড অঞ্চলে রাশিয়া তথা কোনো একক শক্তি যাতে একাধিপত্য কায়েম করতে না পারে তার জন্য এখানে প্রতিযোগিতা হয়েছে এবং ব্রিটেনের দ্বারা ক্ষমতা ভারসাম্য তৈরি হয়েছে। এ প্রসঙ্গে স্পাইকম্যানের উল্লেখযোগ্য উক্তি হল 'যে রিমল্যান্ডকে শাসন করবে সে ইউরেশিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করবে, যে ইউরেশিয়াকে শাসন করবে সে সমগ্র বিশ্বকে নিয়ন্ত্রণ করবে' (The Geography of Peace by Nicholas J. Spykman, 1944, pp. 126)। তিনি স্থলশক্তি ও নৌশক্তি দুটিকেই সমান গুরুত্ব দিয়ে তার তত্ত্ব রচনা করেন। তার মতে আধুনিক কালে একক শক্তি দ্বারা কোনো রাষ্ট্রের পক্ষেই আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে প্রভাব বিস্তার করা সম্ভব নয় স্থল ও নৌশক্তির মিলিত প্রচেষ্টার মধ্য দিয়েই একটি রাষ্ট্র বিশ্বে আধিপত্য গড়ে তুলতে পারে।

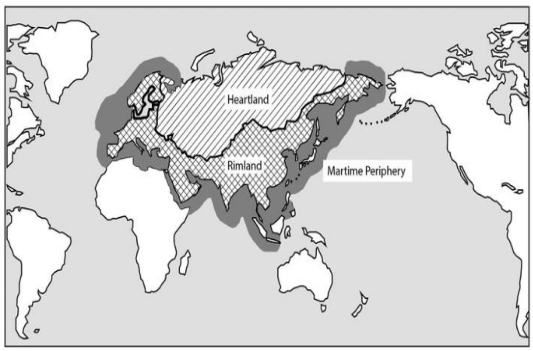

ম্যাকাইন্ডারের হৃদভূমি ও স্পাইকম্যানের রিমল্যান্ড, চিত্র – ০৩

(Source: https://www.researchgate.net/figure/Spykmans-rendition-of-Mackinders-World-Island-from-The-Geography-of-the-Peace_fig3_344819817 accessed on 10 Sep 25)

ভূরাজনীতির আলোচনায় এ সকল তাত্ত্বিকদের পাশাপাশি হেনরি কিসিংগার (Henry Kissinger), জেবিগ্নিউ ব্রেজেন্সকি (Zbigniew Brazezinski), জর্জ কেন্নান (George F. Kennan) প্রমূখ তাত্ত্বিকগণ আধুনিক কালে ভূরাজনীতির তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়েছেন। তবে সাবেকি ভূরাজনীতির তত্ত্বে এসমস্ত আলোচনা থেকে আমরা দেখতে পাই যে আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে আধিপত্য বিস্তারের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের ভৌগোলিক পরিস্থিতি বা ভৌগোলিক অবস্থানকেই একামাত্র মানদণ্ড হিসাবে তাত্ত্বিকরা বিবেচনা করেছেন কিন্তু বর্তমানে আন্তর্জাতিক রাজনীতির চরিত্রের বিপুল পরিবর্তন ঘটেছে। ভৌগোলিক উপাদানের পাশাপাশি রাষ্ট্রের অর্থনীতি, বিদেশ নীতি, কূটনীত, প্রাযুক্তিক কলাকৌশল, উৎপাদন ক্ষমতা, সামরিক সম্ভার প্রভৃতি বিষয় আন্তর্জাতিক রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে ও আধিপত্য বিস্তারের পথকে প্রশস্ত করে। Aerial Warfare বা আকাশপথে যুদ্ধ কৌশল, পারমাণবিক অস্ত্র ও ক্ষেপণাস্ত্রের আবিষ্কার আজ ভৌগোলিক প্রতিবন্ধকতাকে দূর করেছে। সাবেকি ভূরাজনীতির এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গিকে সমালোচনা করে কিছু তাত্ত্বিক ভূরাজনীতির নতুন ব্যাখ্যা প্রদান করেন যা 'Criitical Geopolitics' বা 'সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতি' নামে পরিচিত আবার অনেকে একে 'উত্তর আধুনিক ভূরাজনীতির তত্ত্ব' বলেও উল্লেখ করেন। হেনরি লেফেভরে (Henri Lefebvre), ডেভিড হার্ভে (David Harvey), জন অ্যাগ্নিউ (John Agnew), স্টুয়ার্ট করব্রিজ (Stuart Corbridge), সাইমন ডলবি (Simon Dalby), জিরার্ড টোল (Gerard Toal) প্রমুখ তাত্ত্বিকগণ সবেকি ভূরাজনীতির যে 'Space বা স্থান' কেন্দ্রিক সনাতনী ব্যাখ্যা তা থেকে বেরিয়ে এসে তারা এই 'স্থানের' বহুত্ববাদী ব্যাখ্যা প্রদান করেন। তাদের মতে 'স্থানের' ধারণা ব্যাক্তি উপলব্ধিতে ভিন্ন ভিন্ন হতে পারে। ১৯৯৮ সালে অ্যাগ্নিউ তার 'Geopolitics; revisioning world politics' শীর্ষক গ্রন্থে উল্লেখ করেন যে সাবেকি ভূরাজনীতির প্রবক্তারা সমগ্র বিশ্বকে একটা 'চিত্র' হিসাবে কল্পনা করেছেন এবং নিজ নিজ জাতীয় স্বার্থের নিরিখে ভূরাজনৈতিক তত্ত্বকে উপস্থাপন করেছেন। তার মতে সাবেকি তত্ত্বের মধ্যে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত রাজনীতি রয়েছে আন্তর্জাতিক স্তরে নিজ জাতীয় স্বার্থকে সুরক্ষিত করার। তাই তিনি মনে করেন যে একটি মানচিত্রের ওপর ভিত্তি করে সমগ্র বিশ্ব রাজনীতির সঠিক ব্যাখ্যা প্রদান করা কখনোই সম্ভব নয়। সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতির তাত্ত্বিকগণ ভূরাজনীতিকে বিদেশ নীতি, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, রাজনৈতিক ও সামরিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতার নিরিখে এবং সাহিত্য ও ডিসকোর্স (Discourse) বা ভাষাশৈলীর মধ্য দিয়ে আলোচনার প্রয়াস করেন। ডিসকোর্স যেমন— বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রবন্ধ, মানচিত্র, নথিপত্র, গণমাধ্যমের প্রতিবেদন, চলচ্চিত্র, রাষ্ট্রপ্রধানদের বক্তৃতামালা প্রভৃতি বর্তমান ভূরাজনীতির ব্যাখ্যায় বিশেষভাবে আলোচিত হয়। বিষয়বস্তুগত আলোচনার ভিন্নতার কারনে সমালোচনাধর্মী ভূরাজনীতির মধ্যেও বিভিন্ন ধারা গড়ে উঠেছে যেমন— জনপ্রিয় ভূরাজনীতি (Popular Geopolitics), কাঠামোগত ভূরাজনীতি (Structural Geopolitics), প্রায়োগিক ভূরাজনীতি (Practical Geopolitics), নিয়মনিষ্ঠ ভূরাজনীতি (Formal Geopolitics) অর্থাৎ সবেকি ভূরাজনীতির যে তাত্ত্বিক কাঠামো ও আলোচনা পদ্ধতি তা থেকে বেরিয়ে এসে এসমস্ত তাত্ত্বিকগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন ভাবে ভূরাজনীতিকে চর্চা করেছেন এবং ভূরাজনীতির আলোচনাকে আরও সমৃদ্ধ করেছেন।

References:

1. Agnew, John. Geopolitics: re-visioning world politics. Second edition, Routledge, London, 2003.
2. Banerjee, Jyotirmoy. Strategic Studies. Allied publishers limited, Kolkata, 1998.
3. Cohen, Saul Bernard. Geopolitics: the geography of international relations. Second edition, Rowman & Littlefield, New York City, 2009.
4. Dodds, Klaus. Classical geopolitics revisited. Oxford Research Encyclopedia of International Studies, 2010. https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190846626.013.379
5. Gokmen, Semra Rana. Geopolitics and the study of international relations. School of Social Scienes, Middle East technical university, 2010. https://etd.lib.metu.edu.tr/upload/12612289/index.pdf
6. Kelly, Phil. Rescuing Classical Geopolitics Separating Geopolitics from Realism. International Institute for Global Analyses, 2019.
7. Mackinder, Halford. J. The Geographical Pivot of History. The Geographical Journal, vol. 23, 1904, pp. 421-437. http://www.jstor.org/stable/1775498
8. Mahan, Alfred Thayer. Retrospect and Prospect: Studies in International Relations Naval and Political. University Press, Jhon Wilson & Son, Cambridge, U.S.A, 1902.
9. Waltz, Kenneth. Theory of Internatonal Politics. Waveland press, U.S.A. 1979, pp. 120-122.
10. Zhiding, Hu, and Dadao, Lu. Re-interpretation of the classical geopolitical theories in a critical geopolitical perspective. Journal of Geographical Sciences. 26, 2016, pp. 1769–1784. https://doi.org/10.1007/s11442-016-1357-1